RAY: International Journal of Multidisciplinary Studies, E-ISSN: 2456-3064
Volume IX, No. 2 / October, 2024, pp. 1-8.

পুরাণে পরিবেশচিন্তন; একটি বিশ্লেষণ

Debjani Bhattacharjee
Ph. D. Research Scholar,
Department of Sanskrit,
Rabindra Bharati University,
Kolkata, India.
debjanibhattacharjee15@gmail.com

Structured Abstract:

সারসংক্ষেপ: পুরাণসাহিত্য হল সমগ্র ভারতবর্ষকে জানার মূল চাবিকাঠি। ব্যাসদেব রচিত পুরাণে সৃষ্টিতত্ত্ব থেকে শুরু করে গাছপালা, পশু-পাখি, ফুল-ফল ইত্যাদি পরিবেশ সংক্রান্ত যে ভাবনার প্রতিফলন ঘটেছে তা সত্যই অনবদ্য। পঞ্চমহাভূত হল পরিবেশের অজৈব উপাদানের মধ্যে অন্যতম। সমগ্র জীবের প্রাণের উৎস জল, সেই জলের মাহাত্ম্য বর্ণনা করতে গিয়ে জলকে ভগবান হরির সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে এবং জলাশয় সংরক্ষণের বিধানও দেওয়া হয়েছে শিবপুরাণে। পরিবেশের প্রয়োজনীয় বস্তুর মধ্যে অন্যতম হল বৃষ্টি তার আলোচনাও রয়েছে। বৃক্ষরোপণ, ফুল-ফল, অশ্বত্থ বৃক্ষের মাহাত্ম্য, ভেষজরূপে বৃক্ষের প্রয়োজনীয়তা এগুলির যথাযথ আলোচনা পাওয়া যায় পুরাণগুলিতে। ভবনের কোন দিকে কোন বৃক্ষ থাকা উচিত তার আলোচনাও এখানে পাওয়া যায়। এছাড়াও বিভিন্ন পশুপাখির আলোচনা এবং অনিচ্ছাবশত পশুপাখি হত্যার জন্য প্রায়শ্চিত্তের বিধানও রয়েছে পুরাণসাহিত্যে। বাস্তুনির্মাণ পরিবেশ সুরক্ষার জন্য অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ সেই আলোচনা পুরাণে পাওয়া যায়। পৌরাণিকগণ পরিবেশ সংক্রান্ত বিষয়ে অনেক বেশী সচেতন ছিলেন। পরবর্তীকালে পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য কিছু আইন প্রণয়ন হয়। অর্থাৎ পুরাণে বর্ণিত প্রাকৃতিক পরিবেশ এবং পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখা হল প্রতিটি মানুষের কর্তব্য।

সাংকেতিক শব্দ (Keywords): পুরাণসাহিত্য, পঞ্চমহাভূত, অপ্, বৃক্ষ, পরিবেশ।

প্রণালী (Methodology): আলোচ্য গবেষণাপত্রটি তুলনামূলক এবং বর্ণনামূলকভাবে লিখিত হয়েছে। পুরাণসাহিত্যের ওপর ভিত্তি করে পরিবেশসংক্রান্ত বিষয়ে তথ্যভিত্তিক ধারণার দ্বারা যথাযথ আলোচনা এখানে করা হয়েছে।

প্রকল্প (Hypothesis):

- পুরাণ অনুসারে পরিবেশের বিভিন্ন উপাদান।
- পরিবেশ সংরক্ষণ।
- পরিবেশের অন্তর্গত পশুপাখির আলোচনা।

পরিদৃশ্যমান জগতসংসারকে পরিবেষ্টন করে যে প্রাণী, উদ্ভিদ, পশু-পাখি, আকাশ, বাতাস, গ্রহ-নক্ষত্র ইত্যাদি রয়েছে তাই হল পরিবেশ। অর্থাৎ সমগ্র জগতসংসারে রয়েছে সজীব ও জড় বা অজীব

উপাদান। বিপুল সংখ্যক জনসংখ্যার দরুণ বর্তমান যুগে পরিবেশের যে দূষণ, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ, ভারসাম্যহীনতা পরিলক্ষিত হয় তা কখনই কাম্য নয়। সমগ্র মানবজাতির উচিত পরিবেশের ভারসাম্যহীনতার প্রতি দৃষ্টিপাত করা এবং যে যে সমস্যাজনিত কারণে পরিবেশ দূষিত হচ্ছে সেইদিকে রেখাপাত করা। সংস্কৃত-সাহিত্য আপামর জনগণের নিকট অমূল্য সম্পদ রূপে পরিচিত। যদি এই সংস্কৃত সাহিত্যের দিকে দৃষ্টিপাত করা যায় তাহলে দেখা যাবে যে পরিবেশ রক্ষার চিন্তাভাবনা প্রাচীন যুগেও ছিল। বেদ, উপনিষদ, রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ, স্মৃতিশাস্ত্র, অর্থশাস্ত্র, কাব্য প্রভৃতি আকর গ্রন্থগুলি যদি পর্যালোচনা করা যায় তাহলে দেখা যাবে যে প্রতিটি গ্রন্থেই পরিবেশ ভাবনার অত্যন্ত সুন্দরভাবে প্রতিফলন ঘটেছে। যেহেতু এখানে আলোচনার বিষয় হল পুরাণসাহিত্য তাই এখানে পরিবেশ সংক্রান্ত বিষয়ে কি কি ভাবনার প্রতিফলন ঘটেছে তা আলোচনা করা যাক।

পুরাণসাহিত্য হল সম্পূর্ণরূপে ধর্মীয় রচনার বহিঃপ্রকাশ। পুরাণ হল প্রাচীনকালে ঘটিত ঘটনা। বিভিন্ন দার্শনিক তত্ত্ব, নানাবিধ উপাখ্যান, দেবদেবীর ব্রতকথা, তীর্থমাহাত্ম্য, সাংখ্যতত্ত্ব, সৃষ্টিতত্ত্ব, তুলসী মাহাত্ম্য, গৃহসঞ্চার প্রভৃতি বিবিধ বিষয় পুরাণগুলিতে আলোচিত হয়েছে। কিংবদন্তী অনুসারে বলা হয় যে, বেদবিভাগের রচয়িতা এবং মহাভারতের রচয়িতা ব্যাসদেব হলেন আঠারটি পুরাণ এবং উপপুরাণের রচয়িতা। এই ১৮টি পুরাণের নাম বিষ্ণুপুরাণে পাওয়া যায় (বিষ্ণুপুরাণ, ৩/৬/২১-২৪)। অষ্টাদশ পুরাণগুলি যথাক্রমে ব্রাহ্মপুরাণ, পদ্মপুরাণ, বিষ্ণুপুরাণ, শিবপুরাণ, ভাগবতপুরাণ, নারদীয়পুরাণ, মার্কণ্ডেয়পুরাণ, অগ্নিপুরাণ, ভবিষ্যপুরাণ, ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ, লিঙ্গপুরাণ, বরাহপুরাণ, স্কন্দপুরাণ, বামনপুরাণ, কূর্মপুরাণ, মৎস্যপুরাণ, গরুড়পুরাণ এবং সর্বশেষ ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ। এই ১৮টি পুরাণকে মহাপুরাণ বলা হয়ে থাকে। সাত্ত্বিক, রাজসিক এবং তামসিক এই ত্রিবিধ গুণ অনুসারে পুরাণগুলিকে বিভাজিত করা হয়েছে যার পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা মৎস্যপুরাণে পরিলক্ষিত হয় (মৎস্যপুরাণ, ৫৩/৬৭-৬৮)। যেহেতু পূর্বেই উল্লেখ হয়েছে যে মহাপুরাণের ন্যায় উপপুরাণগুলির সংখ্যা আঠারটি এবং এগুলির নাম কূর্মপুরাণে লিপিবদ্ধ আছে (কূর্মপুরাণ, পূর্ববিভাগ, ১/১৭-২০)। অপরদিকে বৃহদ্ধর্মপুরাণে উপপুরাণের যে তালিকার উল্লেখ রয়েছে সেগুলি হল আদি, আদিত্য, বৃহন্নারদীয়, নারদীয়, নন্দীশ্বর, বৃহন্নন্দীশ্বর, সাম্ব, ক্রিয়াযোগসার, কালিকা, ধর্ম, বিষ্ণুধর্মোত্তর, শিবধর্ম, বিষ্ণুধর্ম, বামন, বারুণ, নারসিংহ, ভার্গব এবং বৃহদ্ধর্ম। অন্যান্য পুরাণে এই পুরাণগুলির নামের পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। উপপুরাণগুলি মূলতঃ পুরাণের খিল অংশ। এগুলি মূলত পুরাণগুলি অপেক্ষা অর্বাচীন। পুরাণগুলির লক্ষণ প্রসঙ্গে বলা হয় যে -"সর্গশ্চ প্রতিসর্গশ্চ বংশো মন্বন্তরাণি চ। সর্ব্বেষ্বেতেষু কথ্যন্তে বংশানুচরিতঞ্চ যৎ।।" (বিষ্ণুপুরাণ, ৩/৬/২৫ এবং বায়ুপুরাণ, ৪/১০) অর্থাৎ পঞ্চলক্ষণ যথাক্রমে সর্গ (সৃষ্টি), প্রতিসর্গ (প্রলয়ের পরবর্তী সৃষ্টি বা নতুন সৃষ্টি), বংশ (দেবতা এবং ঋষিদের বংশবলী), মন্বন্তর (প্রতিটি মনুর শাসনকাল) এবং পঞ্চমটি হল বংশানুচরিত (রাজবংশ ইতিহাস)। পুরাণ সাহিত্যে সৃষ্টিতত্ত্ব, কখনও পানীয়, প্রকৃতি অর্থাৎ বৃষ্টি ও মেঘ প্রসঙ্গে, কখনও বা পশু-পাখি, বৃক্ষরোপন, ফুল-ফল প্রসঙ্গে বর্ণনা করতে গিয়ে পরিবেশ-চিন্তনের যে দিকগুলি ফুটে উঠেছে তা সত্যই অনবদ্য।

শিবপুরাণে সৃষ্টিতত্ত্ব প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে দেখা যায় (শিবপুরাণ, জ্ঞানসংহিতা, ২/৩১) সৃষ্টির আদিতে শুধুমাত্র প্রকৃতি এবং পুরুষ বিদ্যমান ছিল। সেই অব্যক্ত প্রকৃতি থেকে মহতত্ত্ব, মহতত্ত্ব থেকে অহঙ্কার, অহঙ্কার থেকে ষোলটি বিকার অর্থাৎ মন, পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় (চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক), পঞ্চকর্মেন্দ্রিয় (বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ), পঞ্চতন্মাত্র (শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ) এবং এই পঞ্চতন্মাত্র থেকে পঞ্চমহাভূত (ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম)

উৎপন্ন হয়ে থাকে। পুরুষকে যদি যুক্ত করা হয় তাহলে এটি হয় পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব। সাংখ্যদর্শনেও এই পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের পরিচয় মেলে, শ্লোকটি নিম্নরূপ - "প্রকৃতের্মহাংস্ততোঽহঙ্কারস্তস্মাদ্গণশ্চ ষোড়শকঃ।

তস্মাদপি ষোড়শকাৎ পঞ্চভ্যঃ পঞ্চ ভূতানি।।" (সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী, কারিকা ২২)। বিষ্ণুপুরাণেও পুরুষোত্তম অর্থাৎ সর্বেশ্বর বিষ্ণুর দ্বারা সৃষ্টির বর্ণনার উল্লেখ রয়েছে (বিষ্ণুপুরাণ, ১/২/৩১-৪১)। "অতোঽস্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ" (শ্রীমদ্ভগবদগীতা, ১৫/১৮) অর্থাৎ সমগ্র জগতে ও বেদে তিনি পুরুষোত্তম নামে পরিচিত। যিনি বিষ্ণু তিনি শ্রীকৃষ্ণ এবং তিনি হলেন দেবাদিদেব মহাদেব। অগ্নিপুরাণেও সৃষ্টিতত্ত্ব প্রসঙ্গে প্রায় একই আলোচনা মেলে। সেখানে বলা হয়েছে ভগবান বিষ্ণু তিনি হলেন নির্গুণ ব্রহ্ম কিন্তু জগৎ সৃষ্টিতে তিনি সগুণ রূপ ধারণ করেছেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে সগুণ ব্রহ্ম প্রসঙ্গে বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন –

"অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্।

প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া।।" (শ্রীমদ্ভগবদগীতা, ৪/৬)

অর্থাৎ তিনি হলেন জন্মরহিত, অবিনাশী। তিনি প্রকটিত হন যোগমায়া দ্বারা। অগ্নিপুরাণে প্রকৃতি থেকে মহতত্ত্ব এবং সেই মহতত্ত্ব থেকে অহঙ্কারের উদ্ভব ঘটেছে। অহঙ্কার প্রসঙ্গে বলা হয়েছে অহঙ্কার যথাক্রমে দুই প্রকার বৈকারিক এবং তামসিক। বৈকারিক অহঙ্কার থেকে উৎপন্ন হয়েছে শব্দতন্মাত্র আকাশ এবং এই আকাশ থেকে স্পর্শতন্মাত্র বায়ু, তারপর বায়ু থেকে রূপতন্মাত্র অগ্নি, অগ্নি থেকে রসতন্মাত্র জল এবং এই জল থেকে গন্ধতন্মাত্র পৃথিবী সৃষ্ট। অপরদিকে তামসিক অহঙ্কার থেকে তৈজস দশেন্দ্রিয় এবং দশেন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতা দশ দেবতা ও মন উৎপন্ন হয়ে থাকে, এই মন যথাক্রমে একাদশ ইন্দ্রিয় নামে অভিহিত (অগ্নিপুরাণ, ১৭/৩-৬)। অপরদিকে মার্কণ্ডেয়পুরাণে সৃষ্টিতত্ত্ব আলোচনা অগ্নিপুরাণের অনুরূপ (মার্কণ্ডেয়পুরাণ, ৪৫/৩২-৫৫)। কিন্তু এখানে সাংখ্যদর্শনের ন্যায় অহঙ্কার হল ত্রিবিধ; সাত্ত্বিক, রাজস এবং তামস। বরাহপুরাণের দ্বিতীয় অধ্যায়ে, গরুড়পুরাণের পূর্বখণ্ডের চতুর্থ অধ্যায়ে সৃষ্টিতত্ত্ব প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। অপরদিকে কূর্মপুরাণের পূর্বভাগের চতুর্থ অধ্যায়ে পঞ্চমহাভূত প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। এগুলি হল পরিবেশের অন্তর্গত অজৈব উপাদান।

পঞ্চমহাভূতের মধ্যে অপ্ বা জল হল অতীব প্রয়োজনীয় বস্তু। যেকোন ধর্মীয় অনুষ্ঠানে, সন্ধ্যাবন্দনায়, তর্পণে, শ্রাদ্ধকল্পে জলের প্রয়োজন অবশ্যম্ভাবী। অগ্নিপুরাণে জলের মাহাত্ম্য প্রসঙ্গে বর্ণনা করতে গিয়ে বলা হয়েছে অপ্ বা জল হল ভগবান হরি। এখানে কূপ, বাপী, তড়াগ প্রতিষ্ঠার কথা বর্ণনা করা হয়েছে। এমনকি এই পুরাণে বাপী, পুষ্করিণী, তড়াগ ইত্যাদি নির্মাণের ক্ষেত্রে কতটা পরিমাণ গভীরতা হওয়া প্রয়োজন তার যথার্থ বর্ণনা রয়েছে।

"অশ্বমেধসহস্রাণাং সহস্রং যঃ সমাচরেৎ।।

একাহং স্থাপয়েৎ তোয়ং তৎ পুণ্যমযুতাযুতম্।" (অগ্নিপুরাণ, ৬৪/৪২-৪৩)

অর্থাৎ সহস্র অশ্বমেধ যজ্ঞ করলে যে ফললাভ হয়ে থাকে যদি একাহ সলিল নির্মাণ করা হয় তাহলে অশ্বমেধ যজ্ঞ অপেক্ষা অযুতাযুত ফললাভ হয়। অপ্ বা জল হল ঋগ্বেদে দেবতাবিশেষ। অপ্ দেবতার উদ্দেশ্যে যে মন্ত্রটি রয়েছে সেটি হল –

"আপো হিষ্ঠা ময়োভুবস্তা ন উর্জে দধাতন।

মহে রণায় চক্ষসে।।" (ঋগ্বেদসংহিতা, ১০/৯/১)

অর্থাৎ এখানে অপ্ দেবতার উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে যে, তিনি হলেন সুখের আধার। তিনি যেন অন্ন সঞ্চয় করে দেন। তিনি যেন বৃষ্টি দান করেন।

অগ্নিপুরাণে সপ্তষষ্টিতমোঽধ্যায়ে ভগ্ন-জীর্ণ কূপ, বাপী, তড়াগ এগুলি উদ্ধার বা সংস্কারের মাধ্যমে মহাফললাভের কথা বর্ণিত হয়েছে। ব্রহ্মপুরাণে ভারতবর্ষ প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে সমগ্র দেশের অন্তর্গত যে যে নদীর কথা বলা হয়েছে সেগুলি হল শতদ্রু, চন্দ্রভাগা, নর্মদা, সুরমা, তাপী, পয়োষ্ণী, কাবেরী, গোদাবরী, ভীমরথী প্রভৃতি। এখানে বলা হয়েছে যে, এই নদীগুলি নাম শ্রবণের মাধ্যমে জীবগণের পাপ দূরীভূত হয় (ব্রহ্মপুরাণ, ১৯/১০-১২)। নদীর প্রসঙ্গে আলোচনা বরাহপুরাণেও পাওয়া যায়। সেখানে উল্লেখযোগ্য নদীগুলি হল সীতা, অলকানন্দা, চক্ষু, ভদ্রা, ব্রহ্মপুত্র ইত্যাদি। এখানে বলা হয়েছে ব্রহ্মপুত্র নদীর জল পান করলে আরোগ্য প্রাপ্তি হয় (বরাহপুরাণ, ৮২/২)। অন্নংভট্ট রচিত তর্কসংগ্রহ গ্রন্থে অপ্ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, জল হল শীতস্পর্শ বিশিষ্ট। যেটি হল দুই প্রকার নিত্য এবং অনিত্য। নিত্য প্রসঙ্গে বলা হয়েছে এটি হল পরমাণুরূপ অপরদিকে অনিত্য হল কার্যরূপ। এই কার্যরূপ জল তিনপ্রকার। সেগুলি যথাক্রমে শরীর, ইন্দ্রিয় এবং বিষয়। শরীর প্রধানত বরুণলোকে প্রসিদ্ধ হয়ে থাকে। জিহ্বার অগ্রে অবস্থিত জলীয় ইন্দ্রিয় রসনা। অপরদিকে জলাশয়, নদী, সমুদ্র ইত্যাদি জলীয় বিষয় রূপে অভিহিত (তর্কসংগ্রহ, পৃষ্ঠা ৩৭)। "বিশ্বস্য মাতরঃ সর্ব্বাঃ সর্ব্বাঃ পাপহরাঃ স্মৃতাঃ" (মার্কণ্ডেয়পুরাণ, ৫৭/৩১) নদী হল মাতৃস্বরূপা ও পাপনাশক। এছাড়াও মৎস্যপুরাণের অষ্টপঞ্চাশোঽধ্যায়ে পুষ্করিণী, কূপ, তড়াগ, সরোবর প্রভৃতি নির্মাণের কথা বর্ণনা করা হয়েছে। সমস্ত দানের মধ্যে জলদান হল উত্তম দান। যদি কোন ব্যক্তি জলাশয় নির্মাণ করেন সেই ব্যক্তির কূল পাপমুক্ত হয় (শিবপুরাণ, ধর্ম্মসংহিতা, ২২/১-৩)। যিনি তড়াগ নির্মাণ করেন তিনি সর্বদা পূজিত হন এবং সূর্যলোকে গমন করেন। অপ্ প্রসঙ্গে বর্ণনা করতে গিয়ে জলের উৎস হিসাবে বৃষ্টির প্রসঙ্গ এসেছে। বিষ্ণুপুরাণে বলা হয়েছে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড রক্ষার জন্য বৃষ্টির প্রয়োজন অবশ্যম্ভাবী। বৃষ্টির জল প্রাণীকুলের জীবনদায়ী ওষধিগণের পোষণকারী। মেঘ থেকে নির্গত জলের মাধ্যমে ওষধিগণ বর্ধিত হয় তার ফলে প্রজা সকলের ঐহিক এবং পারলৌকিক কল্যাণসূচকের কারণ হয় (বিষ্ণুপুরাণ, ২/৯/১৯-২০)। অপরদিকে অতিবৃষ্টি অনেকসময় পরিবেশে বিপর্যয় ডেকে আনতে পারে। বৃষ্টির জলের দ্বারা যে শস্য উৎপন্ন হয় তার দ্বারা মানুষ জীবনধারণ করে (মৎস্যপুরাণ, ১২৬/৩৭)।

পরিবেশের অন্তর্গত প্রাণীজগৎ এবং উদ্ভিদজগৎ হল অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য। পশু-পাখি প্রভৃতি রক্ষণাবেক্ষণ এবং সুস্থ ও সুন্দর পরিবেশের জন্য বৃক্ষরোপণ একান্ত কর্তব্য। যদি পুরাণগুলির দিকে আলোকপাত করা যায় তাহলে দেখা যাবে যে পুরাণসাহিত্য এ বিষয়ে যথেষ্টই সচেতন। পৌরাণিক বিশ্বকোষ নামে পরিচিত অগ্নিপুরাণে গো-সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলা হয়েছে যে, "গাবঃ পবিত্রা মাঙ্গল্যা গোষু লোকাঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ" (অগ্নিপুরাণ, ২৯২/১)। অর্থাৎ বলা হয়েছে যে গাবঃ বা সকল গো হল পবিত্র এবং মঙ্গলদায়ক এবং সকল লোক গো-এর মধ্যে প্রতিষ্ঠিত। পদ্মপুরাণে ভিন্ন ভিন্ন বর্ণযুক্ত গো-দান করলে কি কি ফললাভ হয়ে থাকে তার যথাযথ বর্ণনা পাওয়া যায়। এই প্রসঙ্গে ব্রহ্মা বলেছেন যদি কেউ ব্রাহ্মণকে শ্বেতবর্ণা গাভী দান করেন তাহলে সেই মানব ঐশ্বর্যশালী হন, তিনি প্রাসাদে বসবাস করেন এবং ভোগী হন। ধূম্রবর্ণা গাভী হল পাপনাশক। কপিলা বর্ণাযুক্ত গাভী দান করলে অক্ষয় ফল লাভ হয়ে থাকে। অপরদিকে কৃষ্ণবর্ণা গাভী হল অবসাদ বিমোচক। জগৎসংসারে দুর্লভ গাভী হল পাণ্ডুরবর্ণা। গৌরবর্ণা গাভী কুলে বা বংশে আনন্দ প্রদান করে। যিনি

রূপকামী ব্যক্তি তিনি রক্তাক্তী গাভী ও যিনি ধনকামী ব্যক্তি তিনি দান করবেন নীলবর্ণা গাভী। সমগ্র জীবনে বাচিক ও মানসিক পাপ বিনষ্ট হয় কপিলা বর্ণা গাভী দানে (পদ্মপুরাণ, সৃষ্টিখণ্ড, ৪৮/১৬৭-১৭১)। মানুষের বন্ধু হল গো-গণ। যে ব্যক্তির গৃহে গো নেই তিনি হলেন বন্ধুরহিত। "গিরিযজ্ঞস্ত্বয়ং তস্মাদেগাযজ্ঞশ্চ প্রবর্ত্ত্যতাম্" (ব্রহ্মপুরাণ, ১৮৭/৪৯) অর্থাৎ গো-সম্পদ হল মানবগণের কাছে বিবেচিত। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের গো-যজ্ঞ হল তার সর্বোৎকৃষ্ট প্রমাণ। এই অধ্যায়ে বলা হয়েছে যে, সমগ্র গো এবং গর্জনকারী বৃষভের দল যজ্ঞের অন্তিমে গোবর্ধন পর্বত পরিক্রমা করেছিলেন (ব্রহ্মপুরাণ, ১৮৭/৫৮)। এমনকি ইন্দ্রের পূজা পালিত না হওয়ার দরুণ ইন্দ্রের কোপে একটানা সাতদিন প্রবল বারিবর্ষণের মাধ্যমে গো-সকল এবং গোপ-গোপিনীদের জীবন পীড়িত হয়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর অঙ্গুলির দ্বারা গোবর্ধন পর্বত তুলে ধরে সমগ্র গোকুলকে রক্ষা করেছিলেন (ব্রহ্মপুরাণ, ১৮৮/১৪)। বিষ্ণুপুরাণেও অনুরূপ কাহিনী পাওয়া যায়। পদ্মপুরাণে বিভিন্ন বন্য জীবজন্তুর আলোচনা পাওয়া যায় (পদ্মপুরাণ, সৃষ্টিখণ্ড, ১৮/২৮০-২৮৩)। অগ্নিপুরাণে ছাগ, ঐরাবত, মৃগ, শশ, বানর ইত্যাদি পশুদের পূজার কথা এবং দেবতার উদ্দেশ্যে তাদের উৎসর্গের কথা বর্ণিত হয়েছে (অগ্নিপুরাণ, ৩৩/৪৬-৪৮)। এই পুরাণে বিভিন্ন গ্রাম্য এবং বন্য পশু-পাখি সম্বন্ধে আলোচনা রয়েছে (অগ্নিপুরাণ, ২৩১/১১-২০)। বিভিন্ন পাখির আলোচনা প্রসঙ্গে পুরাণে কথিত আছে যে, সত্যযুগে দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুর রাজ্যে সরোবরে বিভিন্ন পক্ষী বিরাজ করত। প্রিয়দর্শন, কারণ্ডব, চক্রবাক, সারস, কুরর এবং অন্যান্য স্ফটিকের ন্যায় পাখি। এমনকি সেখানে হংসেরা গান করছে ও সেই গান শুনে সারসরবে সরোবর আরও মুখরিত হচ্ছে (পদ্মপুরাণ, সৃষ্টিখণ্ড, ৪৫/৫১-৫২), প্রকৃতির কি অপরূপ মেলবন্ধন ঘটেছে এই পুরাণে। মার্কণ্ডেয়পুরাণে কর্মফলজনিত কারণে মানুষ পরজন্মে কি কি রূপে জন্মগ্রহণ করতে পারে তার বর্ণনা দিতে গিয়ে বিবিধ পশুপাখির আলোচনা এসেছে। যেমন বলা হয়েছে; কোন পতিত ব্যক্তির অর্থ চুরি করলে ব্রাহ্মণের জন্ম হয় গর্দ্দভ রূপে, তারপর উপাধ্যায়ের কাছে ছল করলে বা তার ভার্য্যা বা তার কোন বস্তুতে যদি অভিলাষ জন্মায় তাহলে কুকুর জন্ম হয়ে থাকে, যদি কোন ব্যক্তি মাতা-পিতার অবমাননা করেন তাহলে সে গর্দ্দভ হয় ইত্যাদি (মার্কণ্ডেয়পুরাণ, ১৫/১-১৭ এবং ২৪-২৯)।

বিভিন্ন পাখির বর্ণনা পাওয়া যায় পুরাণগুলিতে। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে বলা হয়েছে যে সমগ্র বৃন্দাবন জুড়ে রয়েছে পাখির কলরব। সারস-সারসী, চক্রবাক-চক্রবাকী, হংস-হংসী প্রভৃতি পাখির কলতানের যুগলবন্দী এ যেন প্রকৃতির অপরূপ দৃশ্য। মৎস্যপুরাণেও বিভিন্ন কাহিনীর মধ্য দিয়ে পশুপাখি ও অসংখ্য জন্তুর আলোচনা পাওয়া যায়। উল্লেখ আছে যে মদ্রদেশের অধিপতি পুরুরবা গিরীন্দ্রপাদদেশে উদ্যান দর্শনের সময় প্রচুর পশুপাখি দেখেছিলেন। এখানে মহর্ষি অত্রির আশ্রম অবস্থিত ছিল। মদ্রপতি সেখানে অসংখ্য পশুপাখি এবং অসংখ্য জন্তু দর্শনে অত্যন্ত বিস্ময়ভাবাপন্ন হয়েছিলেন (মৎস্যপুরাণ, ১১৮/৪৮-৬১)। কূর্মপুরাণে যে সমস্ত পাখির হত্যা ও ভক্ষণ নিষিদ্ধ সেগুলি হল; বক, হাঁস, দাত্যূহ, কলবিঙ্ক বা চড়াই, শুক, কুরর (চিল জাতীয় পাখি), জালপাদ, কোকিল ইত্যাদি (কূর্মপুরাণ, উপরিভাগ, ১৭/৩১-৩২)। যে যে পশুহত্যা নিষিদ্ধ তার পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা রয়েছে এই পুরাণে (কূর্মপুরাণ, উপরিভাগ, ১৭/৩৩-৩৪)। বায়ুপুরাণে বলা হয়েছে যে যদি কোন ভিক্ষু অনিচ্ছাকৃতভাবে পশু ও মৃগাদির হিংসা করেন তাহলে তিনি কৃচ্ছ্রাতিকৃচ্ছ্র চান্দ্রায়ণ ব্রতের অনুষ্ঠান করবেন। এই প্রসঙ্গে যে শ্লোকটি রয়েছে সেটি হল –

"অকামাদপি হিংসেত যদি ভিক্ষুঃ পশুন মৃগান।
কৃচ্ছ্রাতিকৃচ্ছ্রং কুর্ব্বীত চান্দ্রায়ণমথাপি বা।।" (বায়ুপুরাণ, ১৮/১৬)।

এই প্রসঙ্গে বেদান্তসারে বলা হয়েছে যে, "প্রায়শ্চিত্তানি পাপক্ষয়মাত্রসাধনানি চান্দ্রায়ণাদীনি" (বেদান্তসার, পৃষ্ঠা ২৯) অর্থাৎ প্রায়শ্চিত্তের উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত হল চান্দ্রায়ণ ব্রত। অর্থাৎ যে ব্রতের ক্রিয়া হল চন্দ্রের ন্যায় হ্রাস-বৃদ্ধিশীল। পুরাণগুলিতে বিভিন্ন পশু-পাখির হত্যার নিষেধ প্রসঙ্গে যে আলোচনা পাওয়া যায় তা থেকে এটি স্পষ্ট যে পৌরাণিক যুগে পশুপাখি সংরক্ষণ বিষয়ে মানুষ যথেষ্ট সচেতন ছিল। পরবর্তীকালে পুরাণসাহিত্যের তত্ত্বকে কেন্দ্র করে পরিবেশের সার্বিক সংরক্ষণের জন্য কিছু আইন প্রণয়ন হয় যেগুলি বন্য পশু প্রাণীদের রক্ষার জন্য প্রযোজ্য; সেগুলি হল বন্যপক্ষি-রক্ষণ আইন ১৯০৫, বন্যপ্রাণী (রক্ষণ) আইন ১৯৭২ ইত্যাদি।

বৃক্ষ হল পরিবেশের অমূল্য সম্পদ। পুরাণগুলির দিকে যদি আলোকপাত করা হয় তাহলে দেখা যাবে যে; পৌরাণিকগণ বৃক্ষ সংক্রান্ত বিষয়ে অত্যন্ত সচেতন ছিলেন যার প্রমাণ হল বৃক্ষরোপণ, বৃক্ষের মাহাত্ম্য প্রভৃতি সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা। ব্রহ্মপুরাণে উল্লেখ রয়েছে যে নৈমিষারণ্য হল অতীব পবিত্র স্থান এবং সেখানে বিভিন্ন বৃক্ষ, পুষ্প বিরাজিত। সেগুলি হল শাল, কর্ণিকার, পনস, খদির, আম্র, জম্বু, কপিত্থ, ন্যগ্রোধ, দেবদারু, অশ্বত্থ, পারিজাত, চন্দন, অগরু, পাটল, বকুল, সপ্তপর্ণ, পুন্নাদ নাগকেশর, তাল, তমাল, নারিকেল, অর্জ্জুন এবং চম্পকাদি বিবিধ বৃক্ষ (ব্রহ্মপুরাণ, ১/৩-৭)। গৃহের কোন দিকে কি কি বৃক্ষ রোপন করা উচিত তার যথাযথ বর্ণনা পাওয়া যায় পুরাণে। সেগুলি হল ভবনের উত্তরদিকে প্লক্ষ বৃক্ষ, পূর্বদিকে থাকবে বট বৃক্ষ, দক্ষিণদিকে আম এবং পশ্চিমদিকে অশ্বত্থ বৃক্ষ রোপন করা অত্যন্ত কল্যাণকর। কন্টকদ্রুম বৃক্ষ যদি গৃহের নিকটে দক্ষিণদিকে উৎপন্ন হয় তাহলে তা শুভ বলে গণ্য। এমনকি বাসগৃহের মধ্যে উদ্যান বা পুষ্পিত তিলশস্য বিরাজের কথা বলা হয়েছে (অগ্নিপুরাণ, ২৮২/১-২)। এমনকি বৃক্ষগুলি রোপনের মধ্যে কতটা পরিমাণ ব্যবধান থাকবে তার আলোচনাও রয়েছে এই অধ্যায়ে। মৎস্যপুরাণেও বাসগৃহে কোন কোন বৃক্ষ শুভ বা অশুভ তার উল্লেখ পাওয়া যায় (মৎস্যপুরাণ, ২৫৫/২০-২৪)। বৃক্ষ থেকে উৎপন্ন আয়ুর্বেদীয় বিভিন্ন ওষুধ যার দ্বারা রোগ নিরাময় হয় সেই আলোচনা রয়েছে অগ্নিপুরাণের ২৭৯ তম অধ্যায়ে এবং ২৮০ তম অধ্যায়ে সর্বরোগের নাশের ওষুধ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। বিষ্ণুপুরাণেও ঔষধীর আলোচনা পাওয়া যায় সেগুলি হল ব্রীহি, যব, গোধূম, অণু বা ক্ষুদ্রধান্য, তিল, প্রিয়ঙ্গু, উদার, কোরদূষ (কেদার ধান্য), চীনক, মাষ, মুদগ, মসূর, নিষ্পাব (শিজ্যা), কুলত্থক, আঢ়ক্য বা অড়হর, চণক বা ছোলা এবং শণ এই সতেরো প্রকার ওষধি হল গ্রাম্য। ব্রীহি, যব, মাষ, গোধূম, অণু, তিল, প্রিয়ঙ্গু, কুলত্থক, শ্যামাক, নীবার, জর্ত্তিল (বন্য তিল), গবেধুক (দেধান), বেণুযব এবং মর্কটক গ্রাম্য ও আরণ্য এই চোদ্দ প্রকার ওষধী যজ্ঞীয় অর্থাৎ যজ্ঞনিষ্পত্তির কাজে ব্যবহৃত ও যজ্ঞ হল এই উভয়বিধের পরম হেতু (বিষ্ণুপুরাণ, ১/৬/২১-২৬)। যেহেতু পুরাণগুলিতে দেবদেবীর উপাসনা, বিভিন্ন দেবদেবীর মাহাত্ম্য, বিভিন্ন পূজার নিয়ম ইত্যাদি সংক্রান্ত বিষয় অধিক মাত্রায় সমাদৃত হয়েছে, তাই বিভিন্ন দেবতার অর্চনা প্রসঙ্গে বিবিধ ফুলের উল্লেখ রয়েছে। ভগবান শিবের আরাধনা প্রসঙ্গে শিবপুরাণে যে যে ফুলের কথা রয়েছে সেগুলি যথাক্রমে- অর্ক, প্রতাপ, কুব্জ, জবাকুসুম, করবী, বন্ধূক, জাতী, অতসী, মল্লিকা, যূথিকা, কর্ণিকার, নির্গুণ্ডী ইত্যাদি। এমনকি উপরিউক্ত পুষ্প সহযোগে শিবের আরাধনা করলে কি ফলপ্রাপ্তি হয় তার আলোচনাও করা হয়েছে (শিবপুরাণ, জ্ঞানসংহিতা, ২৯/২৬-৩০)। অপরদিকে মৎস্যপুরাণেও ভগবান শিবের পূজা প্রসঙ্গে বিভিন্ন ফুলের নামের উল্লেখ আছে (মৎস্যপুরাণ, ৬০/৩৮-৩৯)। বায়ুপুরাণে ৩৮ তম অধ্যায়ে সিদ্ধ সেবিত গিরিশ্রেণী দক্ষিণদিকে অবস্থিত তাদের মধ্যে অচলেন্দ্র শিশির এবং পতঙ্গ উভয় পর্বতের মধ্যবর্তী স্থানে উদুম্বর বন বিরাজমান। সেই বনে নানা প্রজাতির বিহঙ্গ, বৃক্ষ রয়েছে। এই দুই পর্বতের মধ্যভাগে তাম্রবর্ণ সরোবরের পূর্বতীরে আম্রবন বিদ্যমান। গন্ধর্ব, কিন্নর, যক্ষ, নাগ এবং বিদ্যাধরগণ আম্ররস পান করেন। কৃষ্ণ ও পাণ্ডু নামক শৈলবরের মধ্যবর্তী স্থানে যে দেশটি বিরাজমান সেখানে

অবস্থিত সরোবরে স্থল-পদ্মিনী বিদ্যমান এবং সেখানে রয়েছে ন্যগ্রোধ বৃক্ষ (বায়ুপুরাণ, ৩৮/৪৯-৫৫)। পদ্মপুরাণের সৃষ্টিখণ্ডে অশ্বত্থ বৃক্ষরোপণ এবং বৃক্ষটির মাহাত্ম্য প্রসঙ্গে যথাযথ আলোচনা রয়েছে। কথিত আছে যে –

"অশ্বত্থেনৈব ভক্ষ্যেণ রোপণেনৈব যৎফলম্।

তদ্বৈ ক্রতুশতৈর্নৈব পুত্রৈরেব শতৈরপি।।" (পদ্মপুরাণ, সৃষ্টিখণ্ড, ৫৮/৮)

অর্থাৎ, ভক্ষ্য অশ্বত্থ বৃক্ষরোপণে যে ফল লাভ হয়ে থাকে শত যজ্ঞ বা শত পুত্র দ্বারাও অনুরূপ প্রাপ্তি হয় না। এই অধ্যায়ে আরও বলা হয়েছে যে প্রখর তাপে যদি কোন প্রাণী, দেব, দ্বিজ, পশুগণ এই বৃক্ষের আশ্রয় নেয় তাহলে বৃক্ষ রোপন কর্তার অক্ষয় স্বর্গপ্রাপ্তি হয়। এমনকি এখানে এটিও বলা হয়েছে যে স্নানাদির পর যদি কোন ব্যক্তি এই বৃক্ষ স্পর্শ করে তাহলে তিনি পাপ থেকে মুক্ত হন। এই বৃক্ষের মূলে রয়েছেন বিষ্ণু, মধ্যে অবস্থিত এবং অগ্রভাগে ব্রহ্মা (পদ্মপুরাণ, সৃষ্টিখণ্ড, ৫৮/২০)। ভগবদ্গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন পরমেশ্বর হলেন মূল, ব্রহ্মা হলেন প্রধান শাখা। অর্থাৎ সংসাররূপ অশ্বত্থ বৃক্ষ হল অবিনাশী এবং বেদসমূহ হল এর পত্র। যে ব্যক্তি (ব্রহ্ম) অশ্বত্থ বৃক্ষকে জানেন তিনি হলেন বেদবিৎ (শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ১৫/১)। কঠোপনিষদেও সংসাররূপ অশ্বত্থ বৃক্ষের কথা বলা হয়েছে, যার শাখাগুলি নিম্নদিকে অবস্থান করে এবং যার মূল হল ব্রহ্ম। যিনি সর্বলোকের আশ্রয়দাতা (কঠোপনিষদ্, ২/৩/১)। বিষ্ণুপুরাণে কথিত আছে যে ব্যক্তি অকারণবশত বৃক্ষচ্ছেদন করে সেই ব্যক্তি অসিপত্রবন নরকে গমন করে (বিষ্ণুপুরাণ, ২/৬/২৩)।

পরিবেশ ভাবনার অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল গৃহাদি বাস্তু নির্মাণ। এক, দুই, তিন, চার, আট শালা এই ধরণের গৃহগুলি মূলতঃ কোন দিকে নির্মিত হবে তার যথাযথ বর্ণনা পাওয়া যায়। এমনকি পাকশালা, পশুশালা, শয়নগৃহ প্রভৃতি গৃহের কোন দিকে নির্মিত হবে তার আলোচনাও রয়েছে (অগ্নিপুরাণ, ১০৫/ ২৩-৩২)। অপরদিকে মৎস্যপুরাণে ২৫৪ তম অধ্যায়ে চতুঃশাল বাস্তুর স্বরূপ এবং সেগুলির কি কি নাম সেই আলোচনা পাওয়া যায়।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে পুরাণসাহিত্যে পরিবেশ ভাবনা অধিক মাত্রায় সমাদৃত হয়েছে। পুরাণসাহিত্য গুলিতে জলের ব্যবস্থা, পশু-পাখি, গাছপালা, বাস্তুনির্মাণ এগুলির আলোচনার মাধ্যমে বোঝা যায় পৌরাণিক যুগে মানুষ পরিবেশ সংরক্ষণ বিষয়ে অত্যন্ত সচেতন ছিলেন। প্রাচীন যুগে জনসংখ্যা ছিল অনেক কম। ধীরে ধীরে নগরায়ন, শিল্পায়ন হওয়ার সাথে সাথে বন্যপক্ষী, পশু, গাছপালা এগুলি বিষয়ে সতর্কতা বাড়তে থাকে। পুরাণে পরিবেশ সচেতনতার কথা মাথায় রেখেই পরবর্তীকালে পরিবেশবিদরা পরিবেশ সংক্রান্ত বিষয়ে বিভিন্ন আইন প্রণয়ন করেন যা আগামী দিনে সমগ্র পৃথিবীকে সুস্থ ও সুন্দরভাবে গড়ে তুলতে সহায়তা করবে।

গ্রন্থপঞ্জি

গম্ভীরানন্দ, স্বামী (সম্পা.) (২০১৮)। উপনিষদ গ্রন্থাবলী (প্রথমভাগ)। কলকাতা: উদ্বোধন কার্যালয়।

গোপ, যুধিষ্ঠির (২০১১)। তর্কসংগ্রহ। কলকাতা: সংস্কৃত বুক ডিপো।

গোস্বামী, নারায়ণ চন্দ্র (১৪১৮ বঙ্গাব্দ)। সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী। কলিকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার।

পাল, বিপদভঞ্জন (১৪১৫ বঙ্গাব্দ)। বেদান্তসার। কলকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার।

প্রাপ্তভারতী, ব্রজজীবন (সম্পা.) (২০০৮)। ঋগ্বেদ-সংহিতা। দিল্লী: চৌখম্বা সংস্কৃত প্রতিষ্ঠান।

প্রভুপাদ, স্বামী (২০২১)। শ্রীমদ্ভগবদগীতা (যথাযথ)। নদীয়া: ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্ট।

তর্করত্ন, পঞ্চানন (সম্পা.) (১৪০৯ বঙ্গাব্দ)। ব্রহ্মপুরাণ। কোলকাতা: নবভারত পাবলিশার্স।

তর্করত্ন, পঞ্চানন (সম্পা.) (১৪১৮ বঙ্গাব্দ)। বায়ুপুরাণ। কোলকাতা: নবভারত পাবলিশার্স।

তর্করত্ন, পঞ্চানন (সম্পা.) (১৪১৯ বঙ্গাব্দ)। অগ্নিপুরাণ। কোলকাতা: নবভারত পাবলিশার্স।

তর্করত্ন, পঞ্চানন (সম্পা.) (১৪১৯ বঙ্গাব্দ)। বরাহপুরাণ। কোলকাতা: নবভারত পাবলিশার্স।

তর্করত্ন, পঞ্চানন (সম্পা.) (১৪২০ বঙ্গাব্দ)। মার্কণ্ডেয়পুরাণ। কোলকাতা: নবভারত পাবলিশার্স।

তর্করত্ন, পঞ্চানন (সম্পা.) (১৪২২ বঙ্গাব্দ)। বিষ্ণুপুরাণ। কোলকাতা: নবভারত পাবলিশার্স।

তর্করত্ন, পঞ্চানন (সম্পা.) (১৪২২ বঙ্গাব্দ)। শিবপুরাণ। কোলকাতা: নবভারত পাবলিশার্স।

তর্করত্ন, পঞ্চানন (সম্পা.) (২০১৫)। পদ্মপুরাণ (সৃষ্টিখণ্ড)। কোলকাতা: নবভারত পাবলিশার্স।

তর্করত্ন, পঞ্চানন (সম্পা.) (২০১৫)। মৎস্যপুরাণ। কোলকাতা: নবভারত পাবলিশার্স।